

সংকট মোকাবিলায় জাগতিক কৃচ্ছসাধন জরুরি

জার্মান দার্শনিক-সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েবার তার বহুল আলোচিত গ্রন্থ, ‘The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism’-এ দেখিয়েছেন কীভাবে মধ্যযুগে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ (ethics) তদানীন্তন ইউরোপীয় সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়েছিল। রেনেসাঁ এবং রিফর্মেশন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইউরোপে শুরু হয় এক নতুন যুগ; জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর প্রতিফলন দেখা যায়। এর মধ্যে তখন প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বীরা যেসব মূল্যবোধ ধারণ করেন, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল জাগতিক কৃচ্ছ সাধন (worldly asceticism) এবং কর্মের আদর্শ (doctrine of karma), অর্থাৎ এ জীবনে মানুষ যা কিছু উপার্জন করবে, তার পুরোটাই সে ব্যয় করবে না, ভোগ করবে না। তার আয়ের কিছু অংশ সে সঞ্চয় করে রাখবে। তা করতে হলে ব্যক্তি মানুষকে কৃচ্ছসাধন করতে হবে। ইতিহাস সাক্ষী দেয়-ইউরোপবাসী তা-ই করেছিল। তাদের জীবন ধারণা ছিল-কাজ করতে হবে (karma), উপার্জন করতে হবে এবং কৃচ্ছ সাধনের মাধ্যমে সঞ্চয় করতে হবে। এ ধরনের জীবন আচরণের মাধ্যমে তদানীন্তন ইউরোপীয় সমাজে পুঁজিবাদ বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি হয়; শুরু হয় ইউরোপীয় সমাজে মৌলিক পরিবর্তন। ইউরোপ জন্ম দেয় নতুন সভ্যতার।

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ নানা সংকট অতিক্রম করছে। সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করছে। পাশাপাশি আমরা যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কৃচ্ছসাধনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি, তাহলে সংকট উত্তরণ অনেকটাই সহজ হবে বলে আমি মনে করি।

বর্তমানে বাংলাদেশে জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে। জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করায় বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল এবং সর্বোতভাবে জ্বালানি তেল আমদানিকারক দেশগুলো মারাত্মক সমস্যায় পতিত হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিবছর ৭০ লাখ থেকে ৭৫ লাখ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল ব্যবহার করে। এ তেলের প্রায় পুরোটাই আমদানির মাধ্যমে মেটাতে হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ডিজেল। প্রতিবছর যে জ্বালানি তেল আমদানি করা হয়, তার ৬৫ শতাংশই ডিজেল, যার পরিমাণ ৪৫ থেকে ৫০ লাখ মেট্রিক টন।

জ্বালানি তেলের জোগান দিতে গিয়ে সরকারকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত মিলিয়ে সরকারকে প্রতিবছর ৩০ হাজার কোটি টাকা থেকে ৪০ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হয়। এ প্রেক্ষাপট অনেকটা বাধ্য হয়েই সরকারকে অভ্যন্তরীণ বাজারে বারবার জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির অর্থই হচ্ছে জনঅসন্তোষ সৃষ্টি হওয়া। কারণ এর অভিঘাত সরাসরি জনগণের ওপরে পড়ে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মোট তিনবার জ্বালানি তেলের মূল্য বাড়ানো হয়েছে। ২০ মে সরকার সব ধরনের জ্বালানি তেলের মূল্য লিটারপ্রতি ২০ টাকা বাড়িয়েছে। গত এপ্রিলে প্রথম দফায় প্রতি লিটার জ্বালানি তেলের মূল্য বাড়ানো হয়েছিল। সেই সময় প্রতি লিটার ডিজেলের মূল্য ১৫ টাকা, কেরোসিনের মূল্য ১৮ টাকা এবং পেট্রলের মূল্য ১৯ টাকা এবং অকটেনের মূল্য ২০ টাকা বাড়ানো হয়। দ্বিতীয় দফা গত জুনে ডিজেলের মূল্য অপরিবর্তিত রেখে প্রতি লিটার কেরোসিন, পেট্রোল ও অকটেনের মূল্য লিটারপ্রতি ৫ টাকা বাড়ানো হয়েছিল। তৃতীয় দফায় সব ধরনের জ্বালানি তেলের মূল্য লিটারপ্রতি ২০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে বাজারে সব ধরনের পণ্যের মূল্য আরেক দফা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈশ্বিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে এর প্রভাব অনিবার্যভাবে বাংলাদেশের ওপর পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তারপরও প্রতিবারই মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে এর প্রভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎকর্ষা সৃষ্টি হয়, দেখে দেয় অস্থিরতা। কারণ জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ার অর্থই হচ্ছে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়া, পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পাওয়া এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বেড়ে যাওয়া। আমাদের দেশে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী আছেন, যারা অজুহাত পেলেই দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেন। পরিবহন মালিকরা আগের চেয়ে বেশি ভাড়া নিয়ে থাকেন। সরকার পরিবহন ভাড়া নির্ধারণ করে দিলেও ক্ষেত্র বিশেষে তা মানা হয় না। জ্বালানি তেলের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে বিরাজমান উচ্চ মূল্যস্ফীতিকে উসকে দেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে শিল্পকারখানায় উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। কৃষি খাতে উৎপাদন ব্যয় আগের তুলনায় বেড়ে যাবে। আগামী মৌসুমে কৃষি ফলন কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বারবার জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে জাতীয় জীবনে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে।

তারপরও বলতে হবে, এ মুহূর্তে সরকারের কাছে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কোনো উপযুক্ত বিকল্প ছিল না। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ছাড়া কোনো উৎপাদন কার্যক্রম চালানো প্রায় অসম্ভব। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির অর্থই হচ্ছে কলকারখানায় উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়া। এ অবস্থায় দেশের জনগণেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। সরকার শেখের বসে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি করেনি। এটা করা হয়েছে পরিস্থিতির চাপে, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে। বাংলাদেশের জ্বালানি তেলের সংরক্ষণাগারের ধারণক্ষমতা ১৫ লাখ ৪৪ হাজার মেট্রিক টন। এই তেল দিয়ে দেশের জ্বালানি তেলের মাত্র ২ মাসের চাহিদা মেটানো সম্ভব। সরকার জ্বালানি তেলের রিজার্ভের ধারণক্ষমতা এমনভাবে বাড়াতে চায়, যাতে দেশের তিন মাসের জ্বালানি তেলের চাহিদা মেটানো যায়। চীন তেলের যে মজুত গড়ে

তুলেছে, তা দিয়ে তাদের ৬ মাসের চাহিদা মেটানো সম্ভব। আমাদেরও চীনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জ্বালানি তেলের রিজার্ভের ধারণক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন। প্রয়োজন, যাতে অন্তত দেশের ৬ মাসের জ্বালানি চাহিদা মেটানো যায়।

যেহেতু বাংলাদেশ নিজস্ব সূত্র থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্বালানি তেল আহরণ করতে পারে না; তাই এ মুহূর্তে জ্বালানি তেল ব্যবহারে আমাদের কৃচ্ছসাধন করাই হবে যৌক্তিক। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে যাতে কোনো মহল মুনাফা লুটে নেওয়ার সুযোগ নিয়ে যেতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে জ্বালানি তেল এবং যেসব পণ্য উৎপাদনে জ্বালানি তেল সরাসরি অবদান রাখে, সেসব পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংযমী হতে হবে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে ফ্যান ও এসির ব্যবহার কমাতে হবে। আবাসিক ভবনেও বিদ্যুতের ব্যবহার কমানোর উদ্যোগ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, সংকটকালে ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে জাতীয় স্বার্থ দেখাটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আগে যেখানে তিনটি লাইট জ্বালানো হতো, সেখানে একটি বা দুটি লাইট জ্বালানো যেতে পারে। এসব হচ্ছে সাময়িক ব্যবস্থা। বাংলাদেশে যেহেতু জ্বালানি তেলে আত্মনির্ভরশীল একটি দেশ, তাই আমাদের আগামীতেও এ সংকট মোকাবিলা করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেলে স্থানীয় বাজারে তার প্রভাব পড়বেই। অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে তেল-গ্যাসে উত্তোলনের লক্ষ্যে অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে চিহ্নিত আমাদের সমুদ্রসীমায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের উদ্যোগ নিতে হবে। উল্লেখ্য, ভারত ও মিয়ানমার তাদের চিহ্নিত সমুদ্রসীমায় বেশকিছু গ্যাসক্ষেত্র এবং জ্বালানি তেলের মজুত খুঁজে পেয়েছে। আমাদেরও এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে।

মূল্যক্ষীতির হার অনেক দিন ধরেই উর্ধ্বমুখী রয়েছে। নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। তাই আমাদের এমনভাবে চলতে হবে যেন ন্যূনতম চাহিদা মেটানো যায়। বিলাসবহুল জীবনযাত্রা আপাতত পরিহার করতে হবে। পরিবহন ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের মিতব্যয়ী হতে হবে। একান্ত জরুরি না হলে স্বল্পদূরত্বে পদব্রজে গমন করা যেতে পারে। প্রাইভেট কারের পরিবর্তে কিছুদিন আমরা পাবলিক বাস ও ট্রেনে যাতায়াত করতে পারি। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে আপাতত কিছুদিন আমরা এসি, ফ্যান কম ব্যবহার করতে পারি। যেসব আমদানি পণ্যের বিকল্প হিসাবে দেশীয় পণ্য পাওয়া যায়, আমরা সেগুলো ব্যবহার করতে পারি। খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সংযমী হওয়ার পাশাপাশি অন্য উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হতে হবে। ঢাকা শহরের আবাসিক ভবনগুলোতে ব্যবহৃত জেনারেটরের প্রচুর ডিজেল খরচ হয়। বিদ্যুতের বিকল্প হিসাবে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এক্ষেত্রেও আমরা একটু কষ্ট স্বীকার করলে জেনারেটরে ব্যবহৃত ডিজেলের ওপর নির্ভরতা কমে আসবে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়কল্পে সাধারণ লাইটের পরিবর্তে এনার্জি সেভিং লাইট ব্যবহার করা যেতে পারে। উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তদের অনেকের মাঝেই অপচয় করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এটা আপাতত পরিহার করতে হবে।

জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধজনিত অভিঘাত নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সবাইকে সম্মিলিতভাবে সংকট মোকাবিলা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, কোনো সংকটই চিরস্থায়ী নয়। তাই আপাতত আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সম্ভব সব ক্ষেত্রে কৃচ্ছসাধন করতে হবে। জাতির এ সংকট মুহূর্তে আমাদের কিছুটা হলেও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

লেখকঃ ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী: প্রফেসর ইমেরিটাস, সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সাবেক রাষ্ট্রদূত